লেনদেন

যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়
হরিশচন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়।
নূতন বসন রাখে করিয়ে যতন
রাজার কটকে পরে সেই সে বসন।।

ছোটবেলায় বড়মার কাছে শুনেছিলাম ছড়াটা এবং এরকম আরও অনেক ছড়া। বড়মা হলেন আমার মায়ের দিদিমা, অর্থাৎ আমার দিদিমার মা। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বড়মার। ষোল বছর বয়সে তিনটি সন্তান নিয়ে বিধবা হলেন। আমার দিদিমারও বিয়ে হয় খুব অল্প বয়সে, তখনকার রীতি মেনে। আমার মা'র সতেরো বছর বয়সে দিদির জন্ম হয়। আমার জন্ম তার তিন বছর পরে।

আজকালকার দিনে দিদিমার পর্যায়ে পৌঁছতে পৌঁছতে বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পেরিয়ে যায় অনেকের। ছেলেমেয়েরা দিদিমার মায়ের সঙ্গ উপভোগ করার মত অবস্থায় পৌঁছবার আগেই তিনি গত হন কিংবা জরাভারে পুরোপুরি অথর্ব হয়ে পড়েন।

বক্সারে থাকাকালে বড়মা আমাদের কাছে ছিলেন। সেখান থেকে বাবার দ্বারভাঙ্গায় বদলি হলে পর আমাদের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গায় এলেন বড়মা। দ্বারভাঙ্গায় বছর খানেক থেকে কলকাতায় মেয়ের কাছে ফিরে গেলেন।

আমার বড়মার যখন স্বর্গবাস হল তখন আমি কলেজে পড়ি। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে তার দু'বছর আগে। দিদির বিয়ের সময় এসেছিলেন বড়মা। আমাদের প্রায় সব আত্মীয়েরাই এসেছিলেন। খুড়তুতো - পিসতুতো - মামাতো বোনই আঠারোজন। তাদের মধ্যে দু'জন দিদির থেকে দু-তিন বছরের বড়, যোগ্য পাত্র জোগাড় হয়ে ওঠেনি তখনও। সেই দুই দিদি, ডলিদি আর টোকনদি, ছিল দলের পাণ্ডা। বাসর ঘরে এমন সব রসিকতা আর প্র্যাক্টিকাল জোক আরম্ভ করে দিলো যা বলার নয়। পরে জামাইবাবু দিদিকে বলেছিলেন তিনি নাকি বাথরুম

যাবার নাম করে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব করেছিলেন।

বর বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে গেলে কনে লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যায়। বাসরঘর থেকে বর পালালে আমার দিদির কপালে কি খেতাব জুটতো কে জানে! বড়মা শেষরক্ষা করলেন। জামাইবাবু দরজা অব্দি পৌঁছনোর আগেই বড়মা হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বাসরঘরে এসে উপস্থিত হলেন এবং নাতজামাইয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলেন। বললেন অমন টুকটুকে নাতজামাইকে তাঁর ভীষণ মনে ধরেছে; বরের উপর তাঁরই নাকি অগ্রাধিকার। বড়মার সেই ডায়ালগ আউড়ে দিদিদের দল হাসাহাসি করে বাসর ঘরে হুল্লোড় করে কাটালো আর আমার জামাইবাবু বাকি রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিলেন।

আমার স্বামী বড়মাকে দেখেনি। আমাদের বিয়েতে অবশ্য বরকে সেরকম কোন বিপত্তিতে পড়তে হয়নি। রেজিস্ট্রি বিয়ে, বাসরের বালাই-ই ছিল না। তবু বড়মা আমার বরকে দেখতে পেলো না সে দুঃখ আমার এখনও আছে। বড়মার আরও অনেক গল্প আছে। সে সব আরেক দিন বলবো।

কলেজে ঢোকার পর হরিশচন্দ্র রাজার ওই ছড়াটা প্রায়ই আউড়াতাম আমার দিদিকে উদ্দেশ্য করে। আমার দিদির অভ্যাস ছিল তার যত ভাল ভাল শাড়িগুলো বাক্সজাত করে রাখা। সারা বছরে একবারই বড় রকমের কেনাকাটা হত আমাদের বাড়িতে। দুর্গাপুজোর ঠিক আগে। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই চারদিন প্রত্যেকদিন নতুন জামাকাপড় পরে পুজো দেখতে যেতাম। পুজো শেষ হয়ে যাবার পর যখনই কোথাও বেরোতাম, পুজোর নতুন কাপড় জামাগুলো পরতাম আমি। আমার দিদি ঠিক তার উল্টো। পুজোর পর কাপড়গুলো যত্ন করে তুলে রাখতো। আর বার করতো না।

কলেজে ঢোকার পর শাড়ি ধরলাম। দিদির শাড়ির ভাণ্ডারে নজর পড়লো। আমার শাড়িগুলো অতি অল্প সময়ে কেমন ম্যাটমেটে হয়ে যেতো। এখানে সেখানে খোঁচা লাগা, ঝাল - ঝোল - অম্বলের দাগ। দিদির শাড়িগুলো তখনো আনকোরা নতুন, ভাঁজে শো-রুমের গন্ধ পাওয়া যায়। দিদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওই লাইনগুলো বলতাম। ওর বাক্সজাত শাড়িগুলো যে হরিশচন্দ্র রাজার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ভোগ করছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। কিন্তু কোন ফল হত

না। বাক্সের শাড়ি বাক্স থেকে বার করতো না দিদি। আমাকে পরতে দেওয়া তো দূরের কথা, নিজেও খুঁজে পেতে পুরোনো শাড়ি নিয়ে পরতো, যেগুলো আগের পুজোতে কেনা।

এরপর দিদির হঠাৎ পরিবর্তন এলো একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে। আমাদের পাড়ার পুতুলদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পুতুলদির মা বিয়ের শাড়ি কিনতে পাটনা যাবেন। আমার মা তাই শুনে দিদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "আমার বড় মেয়ের বিয়েতে ওই একটা খরচ থাকবে না। বাক্সভর্তি যে শাড়িগুলো জমিয়েছে ওই দিয়েই বিয়ে দেওয়া যাবে।" ব্যস, এরপর দিদির একেবারে নতুন রূপ। নিজে যেচে আমায় শাড়ি ধার দিতো। শাড়িতে খোঁচ বা ফুচকার ঝোলের দাগ দেখে একটুও রাগ করতো না, ক'দিন পরে আবার হাসি মুখে আর একখানা শাড়ি বার করে দিতো।

- ২ -

অনেক বছর পর হঠাৎই রাজা হরিশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা তখন এলাহাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে চলে যাচ্ছি। জিনিসপত্র গোছগাছ, অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিলিবন্দেজ, সে এক এলাহী ব্যাপার। এর মধ্যে গোল বাধলো একটা প্রায় নতুন প্যারাম্‌বুলেটর নিয়ে। প্র্যামটা কেনা হয়েছিল আমার ছোট ছেলে বুবাইয়ের জন্যে। কিন্তু ব্যবহার হয়নি। প্র্যামে বসালেই বুবাই বেঁকেচুরে নানা কায়দা করে বেল্টের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতো। এমন ছটফট করতো যে প্র্যাম উলটে যাবার দাখিল। অনেকবার চেষ্টা করে ফল হয়নি। অগত্যা প্র্যামটা ব্যবহার করা বন্ধ হল। শেষে পড়ে-ধরে যাবে, কি দরকার বাপু। প্র্যামটা ব্যবহার না হলেও এক কোনে রাখা ছিল। এরপর পাঠানকোট পোস্টিং হলো আমাদের। নতুন প্র্যামটা ফেলে দিতে মন চাইলো না, তাই সেটাও সঙ্গে চললো অন্যান্য লাগেজের সঙ্গে। পাঠানকোট থেকে এলাহাবাদে আসার সময়েও তাই। আসলে বক্সরুমে পড়ে থাকতো এক কোনে, নজরে পড়তো না কারো। পোস্টিং'এর হাঙ্গামার মধ্যে তখন আর কিছু করার সময় থাকতো না। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ট্রাকে তুলে দেওয়া হত।

এলাহাবাদে আমাদের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন মা। আমাদের কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না। শুনলাম মা নাকি এক কাবাড়িওলার সঙ্গে ব্যবস্থা করে

ফেলেছেন, প্র্যামটা সেই কিনে নেবে। আমি তখন ক্যাম্পের স্কুলে অনারারি টিচার। ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে স্কুলের কিছু পেণ্ডিং কাজ শেষ করে যেতে হবে। তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এর উপর নানা জায়গা থেকে নেমন্তন্ন আসছে প্রতিদিন। ক্যাম্পের জীবনে যেমন হয়।

রোববার সকালে ট্রাক আসবে। মালপত্র বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। দেখি প্র্যামটা বারান্দার এক কোনে রাখা আছে। মা বললেন কাবাড়িওলা একটা সমস্যায় পড়েছে। পুরোনো খবরের কাগজ ও রদ্দি বাকি সব নিয়ে গেছে কিন্তু প্র্যামটা রেখে গেছে। বলেছে টাকাটা জোগাড় হলেই নিয়ে যাবে।

"কত টাকা?"

মা বললেন, "কুড়ি টাকা বলেছি। জিনিসটা ব্যবহার হয়নি সত্যি, কিন্তু এত বছর ধরে রাখা আছে, বাড়িতে থেকেই পুরোনো হয়ে গেছে।"

বড়মার কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, "হরিশচন্দ্র রাজার কটক ব্যবহার করেছে প্র্যামটা?"

মা ফিক করে হেসে বললেন, "ঠিক তাই।"

ততক্ষণে কাবাড়িওলা এসে গেল। লোকটা আমার চেনা। আসলাম। আগে খবরের কাগজ বিলি করতো। গেল বছর প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ওর মাটির ঘর ধ্বসে পড়ে ওর সদ্য প্রসুতি বউ ও নবজাত বাচ্চাটা দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। এরপর কিছুদিন কাজকর্ম ছেড়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর উসকো খুশকো চুল নিয়ে ছিন্নমলিন বেশবাসে বাউণ্ডুলের মত পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে আসলাম। কয়েকমাস এরকম থাকার পর আবার থিতু হয়েছে সে। বিয়ে করেছে। কিরাণার দোকানে মুটের কাজ নিয়েছে এবং আজ শুনলাম সাইড বিজনেস হিসেবে শুরু করেছে এই রদ্দিওলার কারবার। মা যে আসলামকেই প্র্যাম বেচতে চলেছেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।

আসলাম আমাকে সেলাম করে মাতাজী অর্থাৎ আমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। মা এসে দাঁড়ালেন। আসলামের সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেন। কিরাণার দোকানে আসলাম পয়লা তারিখে মাইনে পাবে। হাতে টাকা আসবে তার, আর সেই টাকা দিয়েই সে প্র্যামটা কিনতে চায়। কিন্তু পয়লা তারিখের আরও দশ দিন বাকি আছে। আমরা এলাহাবাদ ছাড়ছি পঁচিশ তারিখে। পঁচিশ তারিখের মধ্যে আসলাম প্র্যাম কেনার টাকা জোগাড় করে

উঠতে পারবে না। মা খুব মনযোগ দিয়ে শুনছেন কথাগুলো। গম্ভীর মুখে থেকে থেকে মাথা নাড়ছেন। আসলাম চিন্তান্বিত মুখে মার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার ভারি অবাক লাগছিল। প্র্যামটা নেহাৎই একটা আবর্জনা আমাদের কাছে। আসলামকে ওটা এমনি এমনি দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ওর জন্যে আবার এত ভাবাভাবির কি আছে? কিন্তু মা'কে ডিঙিয়ে কিছু করতে মন চাইলো না। দেখা যাক মা কি বলেন।

মা আসলামকে বললেন (মা'র সেই অনবদ্য হিন্দীতে), "তুমি এক কাজ করো বাছা। টাকাটা মাইনে পেয়ে আমায় পাঠিয়ে দিও। প্র্যামটা আজই নিয়ে যাও।"

আসলামের মুখ স্বস্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মা'র কথামত একটা কাগজে আমাদের ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানা লিখে আসলামের হাতে দিলাম। আসলাম প্র্যাম নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে বারে বারে সেলাম জানালো মা'কে, এবং আমাকেও।

ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছনোর মাস খানেক পরে একটা মানিঅর্ডার পেলাম। কুড়ি টাকার মানিঅর্ডার। আসলাম পাঠিয়েছে। আসলাম মাইনে পেয়েই মানিঅর্ডার করেছিল। ডাক বিভাগের গাফিলতিতে আসতে দেরী হয়েছে।

মা টাকাটা আমার হাতে দিয়ে প্রশান্ত মুখে বললেন, "এই নে।"

আমার তখনও মনে হয়েছিল কুড়িটা টাকার জন্যে এত সব না করে মা প্র্যামটা আসলামকে দান করে দিলেই পারতেন।

তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে আজ অনেক কিছুই নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ও বুঝতে শিখেছি। আজ বুঝতে পারি মা আসলামের সঙ্গে সমভাবে লেনদেনে নেমে তার আত্মবিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে তার স্বাবলম্বী হবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। সামান্য বিশ টাকার জিনিস দান করে তাকে হীন যাচকের পর্যায়ে ঠেলে দেননি।